জীবন যাত্রার মান

জীবনযাত্রার মান বলতে সাধারণত জীবনযাপন প্রদ্ধতির অবস্থাকে বোঝানো হয় যা উন্নয়ন অন্বেষণের জানুয়ারী থেকে মার্চ ২০১২ পর্যন্ত করা একটি গবেষণার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। সাম্প্রতিক এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের তিনটি জেলায় (গাইবান্ধা, শরিয়তপুর ও সিরাজগঞ্জ) বসবাসকারী চরম দারিদ্রের শিকার এমন মানুষের জীবনযাত্রার মান নিয়ে গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণার জন্য এই তিনটি জেলাকে বেছে নেওয়া হয়েছে কারণ এই জেলাগুলোতে প্রাকৃতিক দূর্যোগ বেশি হয়। একদিকে প্রতি বছরই বন্যায় প্লাবিত হয় অন্যদিকে শুষ্কমৌসুমে খরা হওয়ার কারণে পানির স্তর অনেক নিচে নেমে যায়। শরিয়তপুরে পানি ও জমিতে লবণাক্তার সমস্যাও অনেক বেশি। এই তিনটি জেলায় নদী ভাঙ্গনের মাত্রাও অনেক বেশি, যার ফলে বসবাসকারী মানুষ চরম দারিদ্রের শিকার হয় এবং সাথে সাথে মানুষের জমির মালিকনা সমস্যাও অনেক বেশি। এই প্রতিবেদনে মূলত চরম দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রা পদ্ধতি বোঝানোর চেয়ে সময়ের সাথে সাথে জীবনযাত্রার মান পরিবর্তনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২০১১ সালের এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে (www.unnayan.org) এই প্রতিবেদনে প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সাথে তুলনায় পাশাপাশি বিবিএস দ্বারা পরিচালিত খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ (২০১০) এর সূচকের সাথেও তুলনা দেখানো হবে। মাসিক প্রতিবেদনের জন্য তিনটি জেলা থেকে ১০০টি করে মোট ৩০০টি পরিবারকে বেছে নেওয়া হয়েছে। যারা বিশ্বব্যাংক নির্ধারিত দারিদ্রসীমার নিচে (প্রতিদিন গড় প্রায় ১.২৫ ডলারের নিচে) জীবনযাপন করে। অন্যান্য কিছু বিষয়ের পাশাপাশি পাঁচটি মৌলিক অধিকারের অবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ (২০১০) এর সূচকের সাথে সঙ্গতি বজায় রাখায় চেষ্টা করা হয়েছে।

মূলত যে সব সূচকের মাধ্যমে এই প্রতিবেদনটি করা হয়েছে সেগুলো হলো:
আয়ের ক্ষেত্রে আয়ের উৎস, আয়ের পরিমান, মাথাপিছু আয়, দারিদ্রতার পরিমান বিষয়গুলোকে দেখা হয়েছে।

ব্যয়ের ক্ষেত্রে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুনঃউৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ ও অন্যান্য ব্যয়বহুল ক্ষেত্রে মাথাপিছু ব্যয়ের বিষয়টিকে দেখা হয়েছে।

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে মাথাপিছু শর্করা আমিষ, চর্বি ও ভিটামিন গ্রহণের বিষয়টিকে দেখার পাশাপাশি প্রতিদিন মানুষের গড় কিলোক্যালরি গ্রহণের পরিমানও হিসাব করা হয়েছে।

সামাজিকভাবে নারী পুরুষের মাঝে আরোপিত বৈষম্যের ক্ষেত্রে মূলত চারটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এ গুলো হলো নারী শিক্ষার হার, নারীর উচ্চশিক্ষার হার (এস,এস,সি বা তার বেশি), পরিবারের নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের হার।

আয়ের উৎস, আয়ের পরিমান ও দারিদ্রতার হার

এই ত্রৈমাসিক জরিপ থেকে জানা যায় যে, অধিকাংশ মানুষ শ্রমিক যারা অন্যের জমিতে মজুরির বিনিময় কাজ করে, এদের পরিমান শতকরা প্রায় ৬১ প্রথম ভাগ প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ছিল প্রায় ৬১.৭৮ ভাগ। আয়ের উৎসের দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থান রয়েছে জীবিকা নির্বাহের জন্য কৃষি যার পরিমান শতকরা প্রায় ২২.২২ ভাগ এবং প্রথম ত্রৈমাসিক প্রবিবেদনে যা ছিল শতকরা প্রায় ২১.৮৯ ভাগ। এই দু'টি প্রধান পেশা ছাড়াও অন্যান্য পেশা হলো জেলে, রিক্সা ভ্যানচালক, ছোট ছোট ব্যবসায়ী, ছোট চাকুরিজীবি, রাজমিস্ত্রি, বাস গাড়ির চালক বা হেলপার।

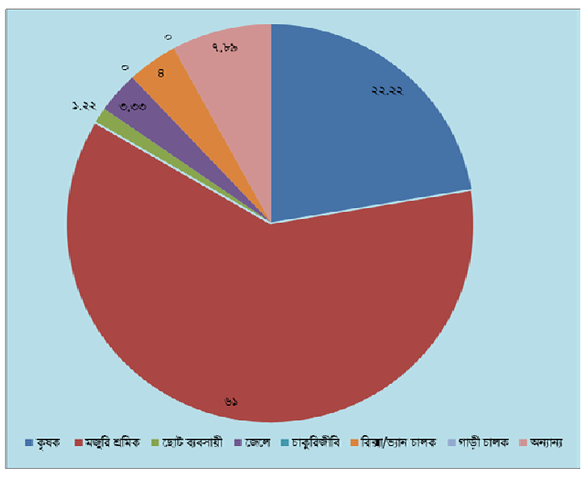

চিত্র-১ঃ আয়ের উৎস

২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের সাথে ২০১২ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের ভিত্তিকে দেখা যায় যে, সিরাজগঞ্জে কোন কৃষক নেই কারণ নদী ভাঙ্গনের ব্যাপকতায় কোন দরিদ্র মানুষের নিজস্ব জমি নেই এ জন্য তারা অন্যের জমিতে মজুরির বিনিময়ে কাজ করে যার পরিমান প্রায় শতকরা ৮১ ভাগ। শরিয়তপুরে তিনটি পেশা রয়েছে কৃষক, মজুরি শ্রমিক ও জেলে যাদের পরিমান যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৪৮ ভাগ, ৪৩ ভাগ ও ৯ ভাগ। পেশার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র রয়েছে গাইবান্ধা, কৃষক শতকরা প্রায় ১৮.৬৭ ভাগ; মজুরী শ্রমিক ৫৯ ভাগ; ব্যবসায়ী ৩.৬৭ ভাগ; জেলে ১ ভাগ; রিক্সা ও ভ্যান চালক ১২ ভাগ; রাজমিস্ত্রি এবং অন্যান্য প্রায় ৫ ভাগ।

সর্বোপরি তিনটি জেলায়ই মজুরি শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি। এই গবেষণায় দারিদ্রকে চারটি স্তরে ভাগ করে দেখা হয়েছে। যাদের গড় আয় মাসিক ০ থেকে ২০০০ টাকা (বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী গড় আয় প্রতিদিন ১ ডলারের কম) তারা চরম দরিদ্র; যাদের গড় আয় মাসিক ২০০০-৩০০০ টাকা (বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী গড় আয় প্রতিদিন ১.২৫ ডলারের কম) তারা দারিদ্র রেখায় অবস্থান করছে। যাদের আয় ৩০০০-৪০০০ টাকা তারা দারিদ্র রেখার কিছুটা উপরে অবস্থান করছে এবং যাদের আয় ৪০০০ টাকার উপরে তারা দরিদ্র নয়।

এই গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, এক-তৃতীয়াংশের (৩৫.৮৯ শতাংশ) বেশি মানুষ চরম দারিদ্রতায় জীবনযাপন করছে যা ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ছিল প্রায় ৬০.৮৯ শতাংশ। অপরদিকে, শতকরা প্রায় ৩৭.৭২ ভাগ মানুষ দারিদ্র রেখায় অবস্থান করছে যা ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ছিল শতকরা প্রায় ২১.৭৮ ভাগ। শতকরা প্রায় ১৯.১৭ ভাগ লোক দারিদ্র রেখার উপরে জীবনযাপন করে। ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে, কোন মানুষেরই আয় ৪০০০ টাকার বেশি ছিল না সেখানে ২০১২ সালের এই প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৭.২৮ শতাংশ লোকের আয় ৪০০০ টাকার বেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আয় দারিদ্রতা কমছে।

এই প্রতিবেদনে আরোও দেখা গিয়েছে যে, গাইবান্ধায় চরম দারিদ্র লোকের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম প্রায় ২৫ শতাংশ এবং শরিয়তপুরে বেশি প্রায় ৪৩.৩৩ শতাংশ।

ব্যয়ের খাত

জীবনধারনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ৬টি উপাদানের ব্যয়কে এই প্রতিবেদনে বিবেচনা করা হয়েছে। এই উপাদানগুলো হলো খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যয়বহুল ব্যয়। এছাড়াও পুনঃউৎপাদনের জন্য বিনিয়োগও হিসাব করা হয়েছে। প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে, মোট ব্যয়ের প্রায় এক তৃতীয়াংশ ব্যয় হয় শুধু খাদ্যের জন্য যা প্রায় শতকরা ২৮.৩৪ ভাগ। প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এই ব্যয়ের পরিমান ছিল শতকরা প্রায় ৩৫.৭৫ ভাগ। বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের জন্য ব্যয় যথাক্রমে শতকরা প্রায় ৯.৬৮ ভাগ, ৩.০৩ ভাগ, ৩.৪৬ ভাগ ও ১.৩৯ ভাগ। খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ (২০১০) গবেষণায় দেখা যায় যে, গ্রামীণ দরিদ্র লোকেরা তাদের ব্যয়ের প্রায় ৭.২৭ ভাগ ব্যয় করে বাসস্থানের জন্য কিন্তু উন্নয়ন অন্বেষণের এই ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে যে, মাত্র ১.৩৯ শতাংশ ব্যয় হয় বাসস্থানের জন্য। অপরদিকে ব্যয় বহুল খরচ (যেমন মোবাইল, ঘড়ি, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি দামি পণ্যসামগ্রীর জন্য ব্যয়) এই গবেষণায় দেখা যাচ্ছে মাত্র ০.৬০ শতাংশ কিন্তু খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ (২০১০) এর গবেষণায় যা ছিল প্রায় ১২.৬১ শতাংশ। সর্বোপরি দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে ব্যয় হচ্ছে খাদ্য ও বস্ত্রেও জন্য। মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রায় ৬ শতাংশ ব্যয় করা হয় পুনঃউৎপাদনের জন্য বিনিয়োগ। এই ধরণের বিনিয়োগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ছোট ছোট মুদির দোকানে বিনিয়োগ শাকসবজি চাষ, গবাদি পশু পালন বা সুদের বিনিময়ে অন্যকে টাকা ধার দেয়া। এই ধরণের বিনিয়োগ থেকে ভাল লাভ হয় বলে জানিয়েছে পরিবারগুলো তার এই ধরণের কোন হিসাব খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ (২০১০) এ নেই।

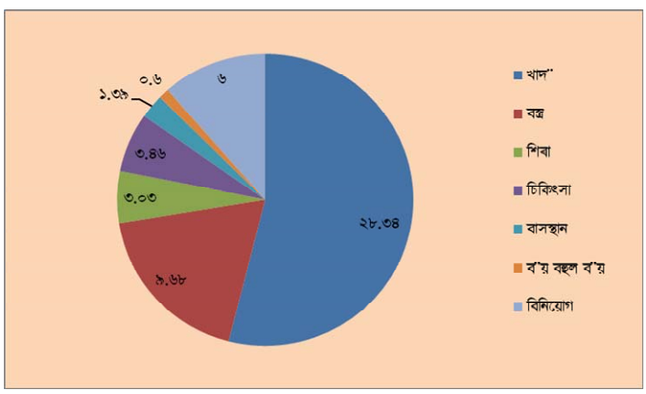

চিত্র-১ঃ ব্যয়ের খাত

এলাকা ভিত্তিক দেখা যাচ্ছে যে, শরিয়তপুরে খাদ্যের জন্য ব্যয় সবচেয়ে বেশি শতকরা প্রায় ৪৫.৬৪ ভাগ।

খাদ্য গ্রহণ

ভাত ও শাক-সবজি এই চর এলাকার মানুষগুলোর প্রধান খাদ্য এ জন্য তাদের খাদ্য তালিকায় শর্করার পরিমান সবচেয়ে বেশি, গড়ে ৪৪৬.৬৭ গ্রাম প্রতিদিন। অপরদিকে, আমিষ, চর্বি, তুলনামূলকভাবে অনেক কম যথাক্রমে গড়ে প্রায় ৫৩.৬৭

গ্রাম ও ২১.৩৩ গ্রাম প্রতিদিন শাক-সবজি বেশি গ্রহণ করায় ভিটামিনের পরিমান তুলনামুলকভাবে সামান্য বেশি গড়ে প্রায় ২৩৫.৮৩ গ্রাম প্রতিদিন। ২০১২ সালের এই ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে দেখা গিয়েছে যে, এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর গড়ে প্রতিদিন মোট ক্যালরী গ্রহণের পরিমান প্রায় ২১১২.৩৩ কিলোক্যালরি যা ২০১১ সালের প্রথম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে ছিল প্রায় ২১৩৭ কিলোক্যালরি এবং খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর গবেষণায় যা ছিল প্রায় ২০৮ কিলোক্যালরি যা এই গবেষণার তুলনায় কিছুটা কম ।

এলাকা ভিত্তিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, শরিয়তপুরের লোকেরা গড়ে প্রতিদিন ২৬৭৬.১৭ কিলোক্যালরি গ্রহণ করছে যা সরকারি হিসাবের তুলনায় অনেক বেশি কারণ এই এলাকায় মানুষের কাছে নদীর মাছের সহজলভ্যতা রয়েছে। অপরদিকে সিরাজগঞ্জ ও গাইবান্ধার মানুষ গড়ে প্রতিদিন যথাক্রমে ১৮৮৭.৫০ এবং ১৭৭৩.৩৩ কিলোক্যালরি খাবার গ্রহণ করছে। খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর হিসাব অনুযায়ী গড়ে প্রতিদিন ২১২২ কিলোক্যালরি। ১৮০৫ কিলোক্যালরি ও ১৬০০ কিলোক্যালরি গ্রহণকারী ব্যাক্তি যথাক্রমে দরিদ্র, চরম দরিদ্র ও অতিমাত্রায় চরম দরিদ্র। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, খাদ্য গ্রহণের দিক দিয়ে শুধুমাত্র শরিয়তপুরের মানুষ দরিদ্র নয় অন্য দুই জেলায় চর এলাকায় মানুষ চরম দারিদ্রতায় জীবানযাপন করছে। তবে গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, একদিকে মূল্যস্ফিতি বৃদ্ধির ফলে এই গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের সীমিত আয়ের দ্বারা পর্যাপ্ত সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে পারছে না অপরদিকে স্বল্পশিক্ষিত হওয়ার কারণে তারা সুষম খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা ও তা সংগ্রহ করার জন্য সচেতন নয়। এ জন্য অসুস্থতার পরিমান বিশেষ করে নারীর অসুস্থতার পরিমান বেশি। অসুস্থ ব্যক্তিদের মাঝে নারীর অসুস্থতার পরিমান শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ।

সামাজিকভাবে নারী পুরুষের মাঝে আরোপিত বৈষম্য

মোট চারটি বিষয়কে কেন্দ্র পরে এই ত্রৈমাসিক গবেষণায় সামাজিকভাবে নারী পুরুষের মাঝে আরোপিত বৈষম্য দেখা হয়েছে। এগুলো হলো:

-নারী শিক্ষার হার (যা শতকরা প্রায় ৩২.২২ ভাগ)
-নারীর উচ্চশিক্ষার হার (যা শতকরা ০.১১ ভাগ; এস,এস সি বা তার বেশি)
পরিবারে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা (যা শতকরা প্রায় ২৭.৬৭ ভাগ)
জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ (যা শতকরা প্রায় ৮০.৩৩ ভাগ)

সুতরাং এই জারিকৃত এলাকায় দেখা যাচ্ছে যে, ৩২.২২ শতাংম নারী শিক্ষিত এবং মাত্র ০.১১ ভাগ নারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ন হতে পারছে। কিন্তু খানা ভিত্তিক আয় ব্যয় জরিপ ২০১০ এর এর গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে, প্রায় ৪.২২ শতাংশ নারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় উত্তীর্ন হচ্ছে। যদিও এই জারিকৃত এলাকাগুলোতে মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয় ভালভাবেই উত্তীর্ন হচ্ছে কিন্তু বাল্য বিবাহ ও পারিবারিক কাজকর্মের জন্য মাধ্যমিকের মাঝামাঝি মেয়েদের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে।

পরিবারে নারীর সিদ্বান্ত গ্রহণের ক্ষমতা খুবই কম অনেক ক্ষেত্রে নারী উপার্জনকারী হওয়া সত্ত্বেও তার উপার্জিত আয় সে নিজের ইচ্ছায় ব্যয় না করে স্বামী বা বাবার হাতে তুলে দিচ্ছে।

জারিকৃত এলাকায় আরো দেখা যাচ্ছে যে, প্রায় ৮০.৩৩ শতকরা নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে। যার মাঝে সিরাজগঞ্জের মাত্র ৫০ শতাংশ নারী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে। এর কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে যে, তারা এই বিষয়ে অজ্ঞতার কারণে সচেতন নয়।

সুতরাং এই গবেষণায় মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে যে, জারিকৃত এলাকার মানুষের আয়ের প্রধান উৎস হলো মজুরি শ্রম এবং জমির সল্পতা ও নদীভাঙ্গনের ফলে অধিকাংশ দরিদ্র লোক তাদের জমির মালিকানা হারাচ্ছে। অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র রেখার নীচে মানবতর জীবনযাপন করছে। এই দরিদ্র জনগোষ্ঠীর তাদের ব্যয়ের প্রায় একতৃতীয়াংশ করে শুধুমাত্র খাদ্যের জন্য এবং খাদ্য তালিকায় শর্করার পরিমানই সবচেয়ে বেশি। নারী শিক্ষার দিক থেকে এই চর এলাকায় জনগোষ্ঠী খুবই পিছিয়ে এবং নারীর ক্ষমতায়নেও পিছিয়ে। কিন্তু বর্তমানে কিন্তু এন,জি,ও ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কিছু সচেতনতামূলক কর্ম তৎপরতার কারণে নারীর ক্ষমতায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের বিভিন্ন সনির্ভর কাজের যোগানের ম্যাধমে। সর্বোপরি যদিও পরিবর্তনের হার খুবই কম তবুও দেখা যাচ্ছে যে, পরিবর্তন হচ্ছে।